উন্নয়ন কৌশল ও কৃষি খাস জমি সুরক্ষার প্রশ্ন

এ.কে.এম. মাসুদ আলী, নির্বাহী পরিচালক
ইনসিডিন বাংলাদেশ

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা উন্নয়ন কৌশল হিসেবে ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনাকে বিবেচনায় রাখব আর তার নিরিখেই কৃষি খাস জমি সুরক্ষার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে দেখব। সূচনা পত্রটিতে আমরা প্রথমে, কৃষি খাস জমি সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিচার করব। দ্বিতীয়ত, বর্তমান উন্নয়ন কৌশলে কৃষি খাস জমি সুরক্ষার বিষয়টি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা খুঁজে দেখব। তৃতীয়ত, চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবে কৃষি খাস জমি সুরক্ষাকে কোন চোখে দেখছে তা বিবেচনায় নেব। পরিশেষে, উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে কৃষি খাস জমি সুরক্ষার প্রস্তাবনা খুঁজে দেখব।

১. কৃষি খাস জমি ও বাংলদেশের কৃষক

বাংলাদেশে ভূমিহীনতার মাত্রা ১২.৮৪ শতাংশ, যা ১৯৯৬ সালে ছিল ১০.১৮ শতাংশ, আর ১৯৮৩-৮৪ তে ছিল ৮.৬৭ শতাংশ (বি.বি.এস.)। সরকারি হিসাব মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৩৩ লক্ষ একর খাস জমি রয়েছে। দেশের ভূমিহীন পরিবারগুলোর মধ্যে এই জমি, পরিবার-পিছু আধা একর বা ৫০ শতাংশ করে বিতরণ করা হলেও এই পরিবারগুলো দারিদ্র সীমার উপরে উঠে আসতে পারতো এবং টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে পারতো। এই ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেশী! ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিয়য়ক প্রতিষ্ঠান (এফ.এ.ও)' এর হিসাব মতে বাংলাদেশে নারীর মালিকানাধীন কৃষি জমির পরিমান ছিল মাত্র ৩.৫ শতাংশ। প্রায় বিশ বছরে এই মালিকানা হ্রাস পেয়ে ২ শতাংশে নেমে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইপিসিসি'র প্রক্কলন অনুযায়ি বাংলাদেশে গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অন্য গবেষণায় (স্টেন, ২০০৭; সারওয়ার ও খান) বলা হচ্ছে, আমাদের সমুদ্র উপকূলের ১৮ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যেতে পারে। আর একটি গবেষণা অনুযায়ি এরই মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষ তাদের আবাস হারিয়েছেন এবং তাদের ৭০ শতাংশ ভূমিহীন হয়ে পরেছেন।[১]

এছাড়াও নগরায়ন, শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও আবাসনের সম্প্রসারণের কারণে প্রতি বছর আমরা ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হারাচ্ছি। উল্লেখ্য, নগরায়ন, শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও আবাসনের সম্প্রসারণের মত ক্ষেত্রগুলোতে সরকারের উন্নয়ন কৌশল ও কার্যক্রম প্রভাব ফেলে ও ভূমি ব্যবহার ও বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে খাস জমি তথা কৃষি খাস জমির উপরও চাপের সৃষ্টি করে। এটি সাধারণভাবে কৃষি জমি সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ও তার পাশাপাশি কৃষি খাস জমি অকৃষিখাতে হস্তান্তর রোধের প্রয়োজনীয়তাও নির্দেশ করে। অন্য দিকে, ভূমিহীন কৃষকের হাতে জমি হস্তান্তরের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য কৃষি খাস জমি সরকারের হাতে থাকা ও তা কার্যকরভাবে কৃষকের হাতে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তাও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, ভূমিহীনতার গতি ধারা ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা প্রভৃতি সূচককে বিবেচনায় নিলে ভবিষ্যতে কৃষি খাস ভূমি সুরক্ষা ও বন্টন প্রক্রিয়াকে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের প্রাসঙ্গিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে মতে বাংলাদেশের মোট ভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৫৭ লাখ ৬৩ হাজার একর যার মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৮০ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর। এর এক-চতুর্থাংশই এখন হুমকির মুখে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে, বছরে বাড়ছে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ। দিনে ২২০ হেক্টরের বেশি কৃষি জমি অকৃষি খাতে যাচ্ছে। বছরে কমছে ৮২ হাজার হেক্টর জমি। যা মোট জমির এক ভাগ। বছরে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে এক হাজার হেক্টর জমি। ৮০ শতাংশ সরকারী খাস জমিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। নির্মাণ কাজের কারণে বছরে বিলীন হচ্ছে তিন হাজার হেক্টর জমি। গত ৩৭ বছরে শুধু ঘরবাড়ি নির্মাণ হয়েছে প্রায় ৬৫ হাজার একর জমিতে ও গত পাঁচ বছরেও আলোর মুখ দেখেনি জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০১০ এবং কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি জোনিং আইন-২০১০। তবে বর্তমান ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, জমির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে চলতি বছরের মধ্যেই নীতিমালা তৈরি করবে সরকার।[২]

বিভিন্ন গবেষণা থেকে কৃষি জমি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কাজনক তথ্য পাওয়া যায়। যেমন সরকারের নিজেস্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) সম্প্রতি প্রকাশিত "বাংলাদেশের কৃষিজমি বিলুপ্তির প্রবণতা" শীর্ষক গবেষণা অনুয়ায়ী, ২০০০ সাল পরবর্তী ১২ বছরে দেশে প্রতিবছর ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর আবাদি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। বিভাগওয়ারি অকৃষি খাতে জমি চলে যাওয়ার প্রবণতা চট্টগ্রাম বিভাগে বেশি। চট্টগ্রাম বিভাগে প্রতিবছর ১৭ হাজার ৯৬৮ হেক্টর জমি, রাজশাহী বিভাগে ১৫ হাজার ৯৪৫ হেক্টর, ঢাকায় ১৫ হাজার ১৩১ হেক্টর, খুলনায় ১১ হাজার ৯৬ হেক্টর, রংপুরে ৮ হাজার ৭৮১ হেক্টর, বরিশালে ৬ হাজার ৬৬১ হেক্টর জমি প্রতিবছর অকৃষি জমিতে পরিণত হচ্ছে। গবেষণা পত্রসমূহ থেকে আরও জানা যায় যে-

[১] Mahmuda Khatun; Climate Change and Migration in Bangladesh: Golden Bengal to Land of Disasters; Bangladesh e-Journal of Sociology; Volume 10, Number 2. July 2013

[২] রাজন ভট্টাচায; জনকণ্ঠ, ৩০ মার্চ, ২০১৪

- গত ৩৮ বছরের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে ১ দশমিক ২৪২ মিলিয়ন হেক্টর।
- প্রতিবছর দেশের ৬৮ হাজার ৭৬০ হেক্টর চাষাবাদ যোগ্য জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতের এক গবেষণা অনুযায়ী ১৯৭২-২০০৯ সাল পর্যন্ত:

- ২৬ লাখ ৬৬ হাজার ৮৫৬ একর জমি অকৃষি খাতে চলে গেছে।
- ঘরবাড়ি নির্মাণ হয়েছে ৬৪ হাজার ৪৮৯ একর জমিতে।
- দোকান নির্মাণ হয়েছে ৬ হাজার ২৬২ একর জমিতে।
- কলকারখানা নির্মাণ হয়েছে ২২২ একর জমিতে।
- বিদ্যালয় দুই হাজার ৮২৭ একর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৪৯৯ একর জমিতে
- মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এক হাজার ৯৯৯ একর জমিতে।

এছাড়াও সড়ক ও রেল যোগাযাগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পর্যটন ও বিনোদন অবকাঠামোর বিস্তার, সেনানিবাস স্থাপন, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা প্রভৃতি কারণেও কৃষি জমির পরিমান কমে আসছে। **ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা মোতাবেক- বিগত ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনাঃ** কৃষি জমির বিভিন্ন অকৃষি ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার ও নদী ভাঙ্গনের কারণে জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে এবং প্রতিবছর আমরা ১ শতাংশ হারে কৃষি জমি হারাচ্ছি। ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের সরকারি জমি যেমন চরের জমি, খাস জমি ও জলাশয়ে প্রবেশাধিকার খুব সীমিত। ভূমি বন্দোবস্ত আইন ও নীতিমালায় ভূমিহীনদের খাস জমি বরাদ্দ দেওয়ার সুস্পষ্ট বিধান থাকলেও প্রকৃত পক্ষে তাদের অধিকার সংরক্ষন করা হয় না। গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গাতেই কিছু স্বার্থান্বেষী মহল পেশীশক্তি ও টাকার বিনিময়ে এই জমি বরাদ্দ নেয়। চট্রগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলসহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ এই সব ভূমিদস্যুদের কারণে তাদের জমিতে অধিকার হারাচ্ছে।[৩]

২. উন্নয়ন কৌশলে কৃষি খাস জমি সুরক্ষার প্রসঙ্গ বিবেচনা

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে চেষ্টা কবব; প্রথমত- কৃষি ও কৃষি জমি সুরক্ষার প্রসঙ্গটি কি ধরণের গুরুত্ব পেয়েছে তা দেখা এবং দ্বিতীয়ত- খাস জমি ও বিশেষত কৃষি খাস জমিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে? এক্ষেত্রে ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) সারাংশের শুরুতেই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকের উল্লেখ করছে-

- প্রথমত; কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও শস্য বহুমূখীকরণ - এটি মূলত আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরায়নের যে চাপ দেখা যাচ্ছে তা মোকাবেলায় সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।[৪]
- দ্বিতীয়ত; জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে নজর দেওয়া হবে- যার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে ভূমি এবং অন্যান্য অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের যে সংকট দেখা দিচ্ছে তা মোকাবেলা করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে[৫]
- তৃতীয়ত; উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে- যাতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কৌশল গড়ে তোলা যায়।[৬]
- চতুর্থত; পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া প্রণয়ণ করা হবে প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা ও এর সঠিক ব্যবস্থাপনা, বায়ু ও পানিদূষণ রোধ, খাসজমি, জলাশয় ও নদীর অবৈধ্য দখল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।[৭]

---

[৩] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৬৮

[৪] কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও শস্য বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকের আয়মূলক কাজের সুযোগ বাড়াতে কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত কৌশল থাকা অবশ্যই জরুরি। একটি শক্তিশালী কৃষিজব্যবস্থা দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরায়নের যে চাপ দেখা দিয়েছে তাতে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে শীর্ষ অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। -ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৪

[৫] কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশ পৃথিবীর বহুল জনঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। গ্রাম এবং শহর উভয় জায়গায় এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা ভূমি এবং অন্যান্য অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিকসম্পদের সংকট দিন দিন তীব্রতর করছে।ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় বাংলাদেশে ভূমি একটি দুস্প্রাপ্য উৎপাদনের উপাদান যার কারণে সারা দেশে বিশেষকরে মেট্রো পলিটন শহরগুলোতে ভূমির মূল্য যেন অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে।-ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫

[৬] ভবিষ্যতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে এই বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু টেকসই প্রবৃদ্ধিতে উপযুক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু তাই নয় সুস্থ ভূমিব্যবস্থাপনা দারিদ্র দূরীকরণ ও মানুষের কল্যানে সরাসরি প্রভাব ফেলে। -ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫

[৭] ষষ্ট পাঁচসালা পরিকল্পনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে, পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূমি ও পানির মতো প্রাকৃতিক সম্পদের মাথাপিছু যে প্রাপ্যতা তা দ্রুতহ্রাস পাচ্ছে। ক্রমাগত মাত্রাতিরিক্ত ও বাছবিচারহীন ব্যবহার আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে অব্যবহার যোগ্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। সম্পদের মানের এই অবনতি মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য ও অন্তরায় বিশেষ করে নারী ও শিশু জ্বালানী ও পানি সংগ্রহের দায়িত্বে থাকায় তারা বেশি ভুক্তভোগী। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ষষ্ট পাঁচসালা পরিকল্পনার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কৌশলটি হবে প্রাকৃতিকসম্পদকে রক্ষা ও এর সঠিক ব্যবস্থাপনা, বায়ু ও

- পঞ্চমত; দক্ষতার উন্নয়ন- যার থাকছে চারটি স্তম্ভ: সরকারি পরিষেবা শক্তিশালীকরণ; স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ শক্তিশালীকরণ; এবং পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সংস্কার।[৮]

এই কৌশলসমূহের মধ্যে আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দিক নির্দেশনার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরতে চাই। প্রথমত; সরকার গ্রামীণ টাউনশিপ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে যেখানে গ্রামের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় হাউজিং, বাজার, কলকারখানা এবং বিভিন্ন অবকাঠামো তৈরি করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণ আইন ও নীতিমালা ও দখলকৃত জমির ন্যায্য ও সাম্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌক্তিক করে তোলা হবে।[৯] দ্বিতীয়ত; ঢাকা ভারসাম্যহীনভাবে বেড়ে উঠার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর অবকাঠামো এবং ভূমি প্রাপ্যতাও দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে যা সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভূতকরণকে ইঙ্গিত করে। কারখানা বর্ধিতকরণ ও উন্নত পরিষেবা ব্যবস্থার সাথে সাথে বাসস্থানও যাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে চলে আসে সেজন্য সরকার ভূমিপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে।[১০] তৃতীয়ত, সরকার উল্লেখ করছে যে, ভূমিহীন কৃষকরা দরিদ্রের মধ্যেও দরিদ্রতম। ভূমি বসতভিটার জন্যও জরুরি। শহরে বস্তিবাসীর দ্রুত বিস্তার ও ভূমির অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি এটাই ইঙ্গিত করে যে, জনগণের জন্য উপযুক্ত আশ্রয় প্রদানে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বাংলাদেশ।[১১]

অর্থাৎ ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার আওতায়, ঢাকার মত মেগাসিটির অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ রোধ করে ভূমি সুরক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। এটি প্রকান্তরে খাস জমিকেও সুরক্ষিত করবে। একইভাবে পরিবেশগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে, খাসজমি, জলাশয় ও নদীকে অবৈধ্য দখল থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে- এটিও খাস জমি তথা কৃষির প্রাকৃতিক ভিত্তি সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

অন্যদিকে, সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ টাউনশিপ গড়ে তোলা ও গ্রামীণ ভূমিহীনদের আবাসন সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে খাস জমির হস্তান্তর বা বন্টন। এক্ষেত্রে কৃষি খাস জমিকে কত অংশে আবাসনের জন্য ব্যবহার করা হবে বা আদৌ হবে কি না সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এই প্রশ্নের মিমাংসা হওয়া জরুরী।

অন্যদিকে খাস জমি বন্টন নীতিমালায় নারীর প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে- তা বিদ্যমান পাঁচশাল পরিকল্পনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। খাস জমিতে নারী অধিকারের প্রসঙ্গ আলোচনার শুরুতেই লক্ষ্যণীয় যে- কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা (১৯৯৮)'তে অগ্রাধিকারের তালিকায় নারীর অবস্থান রয়েছে একেবারে নীচের দিকে। সেখানে বলা আছে, **'সক্ষম পুত্র সন্তানসহ স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা' নারীর খাস জমি পাওয়ার অধিকারের কথা**। অর্থাৎ নাবালক পুত্রসন্তান বা কন্যা সন্তানের মাতা হিসেবে কোন নারী এই তালিকায় স্থান করে নিতে পারবেন না। অথচ নারী উন্নয়ন নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশের অতি দরিদ্রদের দুই তৃতীয়াংশ নারীর অধিকাংশই বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা অথবা তালাক প্রাপ্ত। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্টনে এরকম বৈষম্যমূলক নীতি কার্যতঃ অতি দরিদ্র অধিকাংশ নারীর খাস জমি পাওয়ার অধিকারকে ব্যাহত করছে।[১২]

একই সাথে ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা অনুযায়ি, সরকার জ্বালানী ও শক্তি, রাস্তাঘাট, নদীপথ, রেল ব্যবস্থা, বন্দর, পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, টেলি-যোগাযোগ/তথ্য প্রযুক্তি, গৃহায়ণ এবং পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে[১৩]। এক্ষেত্রেও কৃষি খাস জমি সুরক্ষা কতটুকু দেওয়া হবে তা পরিষ্কার নয়। এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রতিবেদন ও সংবাদচিত্র থেকে উল্লেখ্য[১৪]-

- বিশ্বব্যাংকের উন্নয়নসূচক ২০০৯ অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে দেশের ২০ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করত। ২০০৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ শতাংশ। বৃদ্ধির এই হার দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ।
- নগরায়নের অনুসঙ্গী রাস্তাঘাটের বড় অংশই নির্মিত হচ্ছে কৃষিজমিতে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৩,৫৪৪ কিলোমিটার জুড়ে আছে জাতীয় মহাসড়ক। ৪, ২৭৮ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ১৩,৬৫৯ দশমিক ১৩ কিলোমিটার জুড়ে জেলা সড়ক রয়েছে (মোট সড়কপথের পরিমাণ ২১,৪৮১ কিলোমিটার)। এছাড়াও এলজিইডির ৮০,১১৯ কিলোমিটার পাকা সড়ক রয়েছে।

পানিদূষণ রোধ, খাসজমি, জলাশয় ও নদীর অবৈধ্য দখল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলা ও সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত, গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর কৌশল অত্যন্ত জরুরি।-ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৮

[৮] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৯

[৯] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৮

[১০] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৬

[১১] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫

[১২] এ কে এম মাসুদ আলী; খাস জমিতে নারী-অধিকার প্রসঙ্গে নাগরিক প্রস্তাবনা: রাষ্ট্রের সংবিধানিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ; ইনসিডিন বাংলাদেশ; ২০১৪

[১৩] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৩৩

[১৪] রাজন ভট্টাচায; জনকণ্ঠ, ৩০ মার্চ, ২০১৪

- পরিবেশ অধিদফতরের হিসেবে নগরায়নের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অপরিকল্পিতভাবে দেশে চার হাজার ৫১০টি ইটখোলা গড়ে উঠেছে। যে কারণে বছরে মাটি কাটার ফলে প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমি ফসল উৎপদিত হয় না আর প্রায় ৫০ হাজার একর আবাদি জমি দখল করে আছে ইটখোলাগুলো।

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনায় কৃষি জমি হারানোর বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পন করে বলা হয়েছে; নগরায়ন ও শিল্পায়নের সম্প্রসারণের ফলে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে খাসশস্য উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত কৃষি জমি কমে আসবে। আবাদি জমি স্বল্পতার সমস্যার কারণে অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে।[১৫] অর্থাৎ ভবিতব্য মেনে নিয়ে খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রযুক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মাথায় রাখতে হবে কৃষিতে প্রযুক্তির প্রয়োগ বর্তমানেই প্রায় শীর্ষ পর্যায়ে পৌছেছে এবং তা টেকসইও নয়। কাজেই কৃষি জমি হারানোকে মেনে নেওয়ার অর্থ দাঁড়াচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্বকে বিদায় জানানো। তবে এটি কোন ত্রুটি নয়- ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার উন্নয়ন দর্শনের মাঝেই রয়েছে সচেতনভাবে এক পিচ্ছিল ও বিপদজনক উন্নয়ন পথে হাটার সিদ্ধান্ত।

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার উন্নয়ন দর্শন স্পষ্ঠ হয় দীর্ঘমেযাদী রূপকল্প বিশ্লেষণে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ি- কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে আধুনিক শিল্প উৎপাদন ও সেবা খাত নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর একটি দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ। আর এর জন্য প্রয়োজন দ্রুত গতিশীল অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বক্ষমতা অর্জন। শিল্পে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার মানে এই না যে কৃষিকে অবহেলা করা হচ্ছে। বরং এটি কেবলমাত্র দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাকে মেনে নেয়া। প্রথমত, কৃষির দ্রুত বিস্তার নির্ভর করে জমি প্রাপ্যতার উপর, কিন্তু কৃষি জমির পরিমান অপরিবর্তনশীল এবং চাহিদার উপর (যা আয়ের সাথে সাথে খুব বেশী হারে বাড়ে না)। আর দ্বিতীয়ত, শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হবে এমন একটি কৌশল যা কৃষির মত কম উৎপাদনশীল খাত থেকে শ্রম প্রত্যাহার করে অধিক উৎপাদনশীল কার্যক্রম যেমন শিল্প ও আধুনিক সেবা খাতে প্রতিস্থাপন করবে। কৃষিতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো এবং কৃষি বৈচিত্র্যকরণের দ্বারা কম উৎপাদনশীল বা কম মূল্যমানের ফসল থেকে অধিক উৎপাদনক্ষম বা মূল্যবান ফসল ফলানোর যথেষ্ট পরিমান সুযোগ বিদ্যমান। এটা করা গেলে একদিকে যেমন আয় বাড়বে অন্যদিকে তেমনি নাগরিক ভোক্তাদের জন্য খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা যাবে।[১৬]

অর্থাৎ ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রচ্ছন্নভাবে আশা করা হচ্ছে যে, ক্রমাগত কৃষি থেকে শ্রম প্রত্যাহার এবং ভূমির মত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপকরণকে কৃষিখাত থেকে অধিকতর উৎপাদনশীল কার্যক্রমে নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি থেকে আধুনিক শিল্প উৎপাদন ও সেবা খাত নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর করা যাবে। যদিও কৃষিকে অবহেলা করা হচ্ছে না তথাপি শিল্পখাতকে পরিষ্কার প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এই উন্নয়নধারা স্বভাবতই কৃষিকে উন্নয়ন কৌশলের অধঃস্থন মাধ্যম হিসেবে চিত্রিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ভূমি ও শ্রমকে কৃষিখাতে ধরে রাখার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা খুব একটা সহায়ক না। কৃষি খাস জমি অকৃষিখাতে বন্টনের পক্ষেও এই উন্নয়ন কৌশল শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করে। কৃষি খাস জমি সুরক্ষার চেয়েও বড় একটি ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য- কারণ সাধারণভাবে কৃষি জমির পরিমান কমে যাওয়ার হারকে তা বাড়িয়ে দিতে পারে। মনে রাখতে হবে, এখনও, বাংলাদেশে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখ ৮০৪ যাদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক।[১৭] কাজেই, এই উন্নয়ন কৌশল প্রকান্তরে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবিকার নিশ্চয়তাকে হুমকীর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতার নিরিখে ভূমির ব্যবহার বিবেচনায় না এনে- জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার দিকটিকেও হিসেবে আনতে হবে। এছাড়া কৃষি খাসজমি সুরক্ষার প্রশ্নের মূখ্য তাৎপর্য।

সেবা খাতের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের মত খাতগুলো বিকাশের ক্ষেত্রেও ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা নজর দিয়েছে। যেমন পর্যটন খাত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; পর্যটন খাতে উন্নয়নকল্পে রাঙামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট এবং কুয়াকাটাতে (পটুয়াখালী) টেকসই ও আধুনিক পর্যটন সুযোগ সুবিধা বিকাশ করার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে।[১৮] এক্ষেত্রেও জাতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি ও পর্যটন নীতিতে বর্তমানে কৃষি জমি তথা কৃষি খাসজমি সুরক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।

ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বৈশিষ্ট্য হলো রপ্তানী-নির্ভর উন্নয়ন। এতে একদিকে শিল্পখাতে যেমন পোশাক শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষিখাতে তেমনি চিংড়ি চাষের দিকে মনযোগ দেওয়া হয়েছে।[১৯] চিংড়ি চাষের সাথে শস্য উৎপাদনের সংঘাতের কথা স্বীকার করলেও- ষষ্ঠ পাঁচশালা পরিকল্পনা সেটাকে স্থানীয় সরকার, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ও এনজিও সহ বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় মোকাবেলার আশা প্রকাশ করেছে।[২০] মৎস্য বিষয়ক বার্ষিক পরিসংখ্যান (২০১১-১২) অনুযায়ী, ২০০২-

[১৫] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৭৬
[১৬] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৪৯
[১৭] সিপিডি গবেষণা পত্র, ২০১৪
[১৮] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-১৬১
[১৯] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৫১
[২০] ষষ্ঠ পাচশালা পরিকল্পনা (২০১১-১৫), পৃ-৭০

০৩'এ যেখানে ১.৪১ লক্ষ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হতো, ২০১১-১২'তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে- ২.৭৫ লক্ষ হেক্টরে।[২১] রপ্তানীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি জমি যেমন খাদ্য শস্য উৎপাদনের বাইরে চলে যাচ্ছে- জমিতে লবণাক্ততা বাড়ছে- তেমনি কৃষকের ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তাও পড়ছে হুমকীর মুখে। প্রভাবশালীদের হাতে ক্ষুদ্র কৃষক জমির পাশাপাশি খাসজমিও চিংড়ি চাষের আওতায় চলে আসছে।

৩. উন্নয়ন নীতির প্রেক্ষাপটে কৃষি খাসজমি সুরক্ষার নাগরিক প্রস্তাবনা

দেশে যদিও কৃষিজমি অকৃষি খাতে ব্যবহার রহিত করে আইন প্রণযন করা হয়েছে- তার প্রয়োগ প্রায় অনুপস্থিত। কৃষিজমি অন্যখাতে ব্যবহার করতে হলে সরকারী অনুমোদনের বিধান থাকা স্বত্বেও তা মানা হচ্ছে না এ ছাড়াও জলাধার , বনভূমি ও পাহাড় সুরক্ষা আইন থাকলেও নেই তার যথাযথ প্রয়োগ। ২০১০ সালে ভূমি সংরক্ষণের জন্য সরকারী নীতিমালা করার উদ্যোগ নেয়া হলেও তা করা যায়নি। বর্তমান ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, জমির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারীভাবে একটি ভূমি ব্যবহার নীতমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। নীতিমালাটি এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই খসড়া ঠিক হবে। চলতি বছরে তা চূড়ান্ত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।[২২] আমরা একদিকে যেমন অনতিবিলম্বে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ (বিশেষত প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকের স্বার্থ) মাথায় রেখে বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই নীতিমালার চূড়ান্ত রূপ দানের উদ্যোগ দেখতে চাই। অন্য দিকে তেমনি আশু বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি জমি তথা কৃষি খাস জমির সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ দেখতে চাই।

একই সাথে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার নীতমালার আওতায় কৃষি জমি (খাস জমিসহ) সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকেও আমরা সময়ের দাবী গণ্য করছি। সরকার বর্তমানে বিভিন্ন নীতি (চূড়ান্ত বা খসড়া) প্রণয়নে হাত দিয়েছেন (যেমন চিংড়ি নীতি)- যে সব নীতি কৃষি জমি ও বিশেষত কৃষি খাসজমির উপর প্রভাব ফেলবে তার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় কৃষক প্রতিনিধির (বিশেষত প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক প্রতিনিধির) অংশগ্রহণ ও স্বার্থের প্রাধান্য দেওয়াও জরুরী হয়ে উঠেছে। কৃষক প্রতিনিধি ও কৃষক সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ ছাড়া একটি গণমুখী কৃষি ভূমি সুরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি কৃষক সংগঠণসমূহের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এর পাশাপাশি উন্নয়ন কৌশলে কৃষির প্রতি তথা কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর প্রতি যে বিরুপ দর্শন প্রতিফলিত হচ্ছে তা থেকে বেড়িয়ে আসার সময় এখনই। তা না হলে শুধু কৃষি খাস জমি নয়, সাধারণভাবে কৃষি জমিই হুমকীর মুখে পড়বে। উন্নয়নকে কেবল মাথা পিছু গড় আয়ের সূচকে না মেপে- ভূমিসহ উৎপাদনশীল সম্পদে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি, আয়ের অসমতা হ্রাস ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে- অবশ্যই কৃষি খাসজমি তথা কৃষি জমি সুরক্ষা অতি জরুরী করনীয়। এই ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (ভূমিহীন, নারী, আদিবাসী)'র হাতে কার্যকরভাবে কৃষি খাস জমির হস্তান্তর ও তা ব্যবহারে সহায়তা প্রদান ছাড়া উন্নয়ন কাজ থাকবে অসম্পূর্ণ ।

ভূমি মন্ত্রণালয় যদি ভূমি ব্যাংক গঠণ করে তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন তা বাজারমুখী না হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ (যেমন কৃষি খাস জমি) বৃহৎ কর্পোরেশন বা ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে না দেয়। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব[২৩]- ভূমি ব্যাংক গঠিত হলেও, ভূমিহীনদের হাতে অবাসন ও কৃষি কাজের জন্য খাস জমি/জলা হস্তান্তর করা উচিৎ বিদ্যমান নীতি কাঠামোর মধ্যেই কোন বিনিময় বা লীজ মূল্য ব্যতিরেকেই। ভূমি ব্যাংক তার সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমিহীন নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি অনুসরণ করবে। এই নীতি বাস্তবায়নে বৃহত্তর বিবেচনায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর সমতা নিশ্চিত করা যেমন সময়ের দাবী তেমনি কৃষি ক্ষেত্রে প্রান্তিক/ভূমিহীন নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা (১৯৯৮)'তে প্রয়োজনী প্রতিবর্তন আনাও আজ সময়ের দাবী। একই সাথে উন্নয়নে জাতি ভিত্তিক বৈষম্য দূরে করতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্যও ভূমি ব্যাংকে থাকতে হবে অগ্রাধিকার। এক্ষেত্রে তাদের প্রথাগত ভূমি মালিকানা পদ্ধতির স্বীকৃতি ও আইনী সুরক্ষাও জরুরী। সাধারণভাবে, ব্যক্তি ভূমিহীন বা ভূমিহীন পরিবারের বদলে ভূমি ব্যাংক প্রকৃত ভূমিহীন সমবায় বা যৌথ সমিতিকে খাস সম্পদের বন্টনে অগ্রাধিকার দিলেও খাস জমির কার্যকর ব্যবহার ও মালিকানা ধরে রাখা সহজতর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এর পাশাপাশি আমাদের প্রত্যাশা, সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনা জলবায়ু উৎবাস্তুদের সম্ভাব্য ভূমি চাহিদা বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যাংক ভবিষ্যতদর্শী সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করবে।

আমরা এই প্রবন্ধে দেখেছি যে সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ই কোন না কোন ভাবে কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহারের সাথে যুক্ত বা তার উপকারভোগী। এক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের নীতিপত্রেই কৃষি জমি ও কৃষি খাস জমি সুরক্ষা সমন্ধে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা কামনা করছি।

ঢাকা, ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৪

[২১] Ministry of Fisheries and Livestock; Fisheries Statistical Yearbook of Bangladesh (2011-2012)

[২২] রাজন ভট্টাচায; জনকণ্ঠ, ৩০ মার্চ, ২০১৪

[২৩] বিস্তারিত; ইনসিডিন বাংলাদেশ; ভূমিহীন ও প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ সুরক্ষার উপযোগী ভূমি ব্যাংকের কাঠামোগত প্রস্তাবনা, ২০১৪